ইউনিট ২

খনিজ পদার্থ

ভূমিকা

প্রাক-ঐতিহাসিক যুগ থেকে আজকের আধুনিক যুগ পর্যন্ত মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের মূলে খনিজ পদার্থের অবদান সম্ভবত সবচেয়ে বেশি এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। পাথুরে লবণ থেকে শুরু করে লোহা, তামা, দস্তা, সীসা, কয়লা, জ্বালানী গ্যাস ও হীরকসহ বহু মূল্যবান পাথর ইত্যাদি প্রায় দুইহাজার রকমের খনিজ পদার্থের সন্ধান আমরা পেয়েছি, যা ভূপৃষ্ঠের তলদেশ হতে আহরণ করা হয়ে থাকে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মানুষ খনিজ পদার্থকে নিজের কাজে লাগানোর দক্ষতা অর্জন করেছে। এই খনিজ পদার্থ থেকেই উৎপন্ন হয় সিমেন্ট, লোহা, যা দিয়ে মানুষ বাড়ি ঘর তৈরি করে। কৃষি কাজের জন্য তৈরি হয় সার। সোনা, হীরক ও অন্যান্য পাথর দিয়ে তৈরি হয় মূল্যবান অলংকার, আরও কত কি। উন্নত দেশগুলির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে আমাদের জানতে হচ্ছে খনিজ সম্পদ কিভাবে সুষ্ঠু আহরণ করে অত্যন্ত মিতব্যয়ীর মত কাজে লাগানো যায়। কারণ খনিজ পদার্থকে বহুবিধ কাজে লাগানোর দক্ষতার উপরই নির্ভর করে কোনো দেশ তথা জাতির উন্নতি। এ ইউনিটে খনিজ পদার্থ কি, আকরিক হতে কিভাবে তা আহরণ করা হয়। খনিজ পদার্থের ব্যবহার ও গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ২.১

খনিজ ও সংকর ধাতু

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খনিজ পদার্থের সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- খনিজ পদার্থের প্রকারভেদ আলোচনা করতে পারবেন;
- খনিজ পদার্থ আহরণ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- সংকর ধাতুর বর্ণনা দিতে পারবেন;
- সংকর ধাতুর গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন;
- সংকর ধাতুর ব্যবহার উল্লেখ করতে পারবেন।

খনিজ (Mineral) পদার্থের সংজ্ঞা

স্বভাবজাত অজৈব প্রক্রিয়ায় প্রকৃতিতে উৎপন্ন শিলারূপে কঠিন, পানিরূপে তরল কিংবা বায়বীয় রূপে গ্যাসীয় ধাতব বা অধাতব মৌলিক ও যৌগিক পদার্থকে খনিজ বা খনিজ পদার্থ বলে।

সাধারণ অর্থে, খনি থেকে অর্থাৎ ভূত্বকের গভীর থেকে যা তোলা হয় তাই খনিজ, ব্যাপক অর্থে, বিভিন্ন প্রকার শিলার গঠন উপাদানই খনিজ।

খনিজের উপাদান

- বিভিন্ন খনিজের সংস্পর্শে গঠিত হয় শিলা। আর খনিজ হচ্ছে একটি যৌগিক পদার্থ যা সৃষ্টি হয়েছে ভূত্বকে প্রাপ্ত প্রায় ৯০টি স্বাভাবিক মৌলিক উপাদানের দুই বা ততোধিকের রাসায়নিক সংযোগে। যেমন- হেমাটাইট খনিজটি একটি যৌগিক পদার্থ (Fe_2O_3, ফেরিক অক্সাইড), যা লোহা (Fe) এবং অক্সিজেন (O_2) মৌলের সমন্বয়ে গঠিত।
- অনেক খনিজ আছে যা একটি মাত্র মৌলিক পদার্থ দ্বারা গঠিত। যেমন : সোনা, হীরা, গন্ধক। মৌলিক পদার্থ ৩টিই ভূগর্ভে মৌল হিসাবে পাওয়া যায়। অর্থাৎ এরাও খনিজ পদার্থ।

খনিজের উৎস

প্রকৃতিতে খনিজ সাধারণত দু'প্রকারের স্থানে পাওয়া যায়। খনিজের দুটি উৎস হল-

- ভূ-গর্ভ : খনিজের প্রধান উৎস হল ভূ-গর্ভ। অধিকাংশ খনিজ আহরণের জন্য ভূ-ত্বকের গভীরে খাঁজ কেটে বা গর্ত খুঁড়ে নিচে নামতে হয়। অনেক সময় শিলাস্তরের মধ্যে স্তরে স্তরে খনিজ সঞ্চিত থাকে। খনিজের এ উৎসকে বলা হয় ভূ-গর্ভস্থ খনি। উদাহরণ : দক্ষিণ আফ্রিকায় সোনার খনি ভূ-ত্বকের প্রায় ৩ কিলোমিটার গভীরে এবং আমেরিকায় এগুলো প্রায় ১৬০ মিটার গভীরে অবস্থিত।
- ভূ-পৃষ্ঠ : পূর্বে ধারনা করা হত খনিজের উৎস কেবলই ভূগর্ভ। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। ভূ-ত্বকেও কিছু কিছু খনিজ দ্রব্য দৃষ্ট হয়। এ ধরনের খনিজ উৎসকে বলা হয় ভূ-পৃষ্ঠ খনিজ।
- উদাহরণ : লৌহজাত খনিজ (হেমাটাইট), অ্যালুমিনিয়াম জাত খনিজ (বক্সাইট)। এমন কি কয়লার মত মূল্যবান খনিজও অনেক সময় ভূ-পৃষ্ঠের উপরেই পাওয়া যায়।

খনিজের প্রকারভেদ

খনিজ পদার্থকে সাধারণত নিম্নলিখিত শ্রেণিতে ভাগ করা যায়-

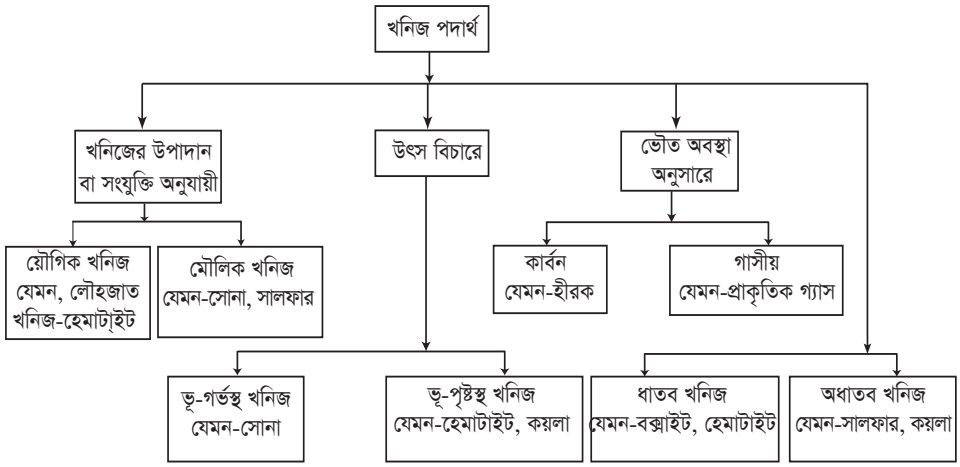

চিত্র ২.১-১ : খনিজের প্রকারভেদ

আকরিক

প্রকৃতিতে বা খনিতে খুব কম পদার্থই মৌলিক হিসাবে পাওয়া যায়। বেশির ভাগ খনিজই একাধিক মৌলের যৌগ হিসাবে থাকে। কোনো একটি বিশেষ মৌলকে সংগ্রহ করতে হলে এমন একটি খনিজের দরকার যার মধ্যে নির্দিষ্ট মৌলটি পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান এবং সুবিধাজনক উপায়ে তা উৎস থেকে আলাদা ও সংগ্রহ করা যায়। এ ধরনের খনিজকে অর্থাৎ যে খনিজ থেকে সহজে এবং লাভজনক উপায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে মৌলিক পদার্থ আহরণ করা যায় তাকে ঐ মৌলের আকরিক বলে। যেমন হেমাটাইট খনিতে পাওয়া যায় শক্ত, দানাদার ও আঁশযুক্ত পদার্থ হিসাবে, যা লোহা এবং অক্সিজেনের যৌগ। এর রাসায়নিক নাম আয়রন অক্সাইড, যা থেকে লোহা নিষ্কাশন করা হয়। তাই হেমাটাইট লোহার আকরিক। এইরূপে অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক হল বক্সাইট। এ দুটিই ধাতব আকরিক।

ধাতুর ন্যায় অধাতুর আকরিকও মাটির নিচে পাওয়া যায়। যেমন : কার্বনের আকরিক হল গ্রাফাইট, কয়লা ইত্যাদি।

আকরিক হতে ধাতু নিষ্কাশন

কিছু কিছু আকরিক, খনিতে মৌল হিসাবে পাওয়া যায়। ধাতব মৌলের মধ্যে প্রকৃতিতে অল্প পরিমাণ প্লাটিনাম, সোনা, রূপা ও পারদ মৌলিক অবস্থায় পাওয়া যায়। অধিকাংশই থাকে যৌগ রূপে। ধাতুর যৌগ আকরিকগুলির মধ্যে থাকে ধাতব অক্সাইড, সালফাইড, নাইট্রেট ইত্যাদি নানা ধরনের অক্সাইড ও লবণ।

প্রকৃতিজাত ধাতব যৌগ বা খনিজ থেকে সহজে এবং অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক উপায়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ধাতু প্রস্ড়ুত ও শোধন করার পদ্ধতিকে ধাতু নিষ্কাশন বলে।

প্রকৃতিতে সব আকরিকই মাটি, বালি ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সাথে মিশ্রিত থাকে। এইসব খনিজ অপদ্রব্যকে খনিজ মল বা গ্যাং বলে। ধাতু নিষ্কাশনের পূর্বে আকরিক হতে অপ্রয়োজনীয় খনিজ মলকে যথাসম্ভব অপসারণ করা হয়। পেষণ ও চূর্ণনের সাহায্যে সকল আকরিককেই ছোট করা হয়। সাধারণত দুটি পদ্ধতিতে ধাতু নিষ্কাশন করা হয়।

- কার্বন বিজারণ পদ্ধতি (উচ্চ তাপ)
- তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি।

কার্বন বিজারণ পদ্ধতি : কপার, আয়রন, জিংক, টিন, লেড ইত্যাদি ধাতুর অক্সাইডকে কার্বনের সাহায্যে বিজারিত করলে সংশ্লিষ্ট ধাতু পাওয়া যায়। ধাতব অক্সাইডকে কার্বন সহযোগে উত্তমরূপে মিশ্রিত করে তীব্র তাপে উত্তপ্ত করলে ধাতব অক্সাইড কার্বন দ্বারা বিজারিত হয়ে ধাতুতে পরিণত হয়। যেমন-

জিংক অক্সাইড + কার্বন = জিংক + কার্বন মনোক্সাইড
($ZnO + C = Zn + CO$)

তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি : গলিত বা দ্রবীভূত আকরিকের মধ্যে দুটি ধাতব দন্ড ডুবিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করা হয়। ফলে গলিত অথবা দ্রবীভূত আকরিত হতে ধাতু বিশি- ষ্ট হয়ে ক্যাথডে জমা হয়। এভাবে ধাতুর নিষ্কাশনকে তড়িৎ বিশ্লেষণ বলা হয়।
সোডিয়াম, এ্যালুমিনিয়াম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি ধাতুর ক্লোরাইড লবণ হতে তড়িত বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধাতু নিষ্কাশন করা হয়।

সংকর ধাতু

দুই বা ততোধিক ধাতুর সমসত্ত্ব বা অসমসত্ত্ব মিশ্রণে যে কঠিন পদার্থ তৈরি হয় তাকে সংকর ধাতু বা ধাতু সংকর বলা হয়।

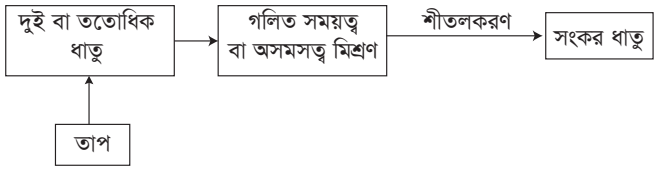

চিত্র ২.১-২ : সংকর ধাতু প্রস্তুতের প্রবাহ চিত্র

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, গলিত তামা ও দস্তা যে কোনো অনুপাতে মিশিয়ে ঠান্ডা করলে এক শক্ত ধাতব পদার্থ পাওয়া যায়। একে ব্রাস বা পিতল বলে। পিতলের গুণাগুণ বা ধর্ম তামা এবং দস্তার গুণাগুণের চেয়ে আলাদা। তামা ও দস্তার মিশ্রণের অনুপাত ভিন্ন করে আমাদের প্রয়োজন মত সংকর ধাতু পিতল তৈরি করতে পারি। শুধু পিতলই নয়, তামা ও টিনের মিশ্রণে ব্রোঞ্জ তৈরি হয়। স্টেইনলেস স্টিলও একটি সংকর ধাতু। এ ছাড়াও কাসা, মনেল মেটাল, জার্মান সিলভার, ডুরালমিন ইত্যাদি সংকর ধাতুর উদাহরণ।

সংকর ধাতুর গুরুত্ব

প্রযুক্তির এই চরম উৎকর্ষতার যুগে বিভিন্ন গুণ সম্পন্ন সংকর ধাতু উৎপাদন করা হচ্ছে। বিভিন্ন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাই সংকর ধাতুর গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের প্রয়োজন অনুসারে দুই বা ততোধিক ধাতু বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত করেও সংকর ধাতু তৈরি করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ডুরালুমিন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকর ধাতু যা এরোপ্লেন তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। এটি তামা, এ্যালুমিনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ ও ম্যাগনেসিয়ামের মিশ্রণে তৈরি হয়। গুরুত্বের বিচারে সংকর ধাতুর গুণাগুণ নিম্নলিখিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় :

- ব্যবহার উপযোগী ধাতব পদার্থ তৈরি করা : ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুণ সম্পন্ন ধাতব পদার্থের প্রয়োজন হয়। কিন্তু একক ধাতুর পক্ষে বিভিন্ন গুণ থাকা সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন অনুসারে দুই বা ততোধিক গুণ সম্পন্ন ধাতুর মিশ্রণের অনুপাত পরিবর্তন করে আমাদের প্রয়োজনীয় গুণ সম্পন্ন সংকর ধাতু তৈরি করা যায়।
- ধাতব ধর্মের নিয়ন্ত্রণ করা :ধাতব পদার্থের উল্লেখযোগ্য ধর্মগুলো হচ্ছে- গলনাংক, নমনীয়তা, সম্প্রসারণশীলতা, ঘনত্ব, কাঠিন্য, ওজন ইত্যাদি।

- সংকর ধাতু তৈরির মাধ্যমে উপরোক্ত গুণাবলী প্রয়োজন মত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।
- তাপ পরিবহন ক্ষমতা হ্রাস ও বৃদ্ধি : সংকর ধাতুর উপাদান ও অনুপাত পরিবর্তন করে প্রয়োজন অনুসারে তাপ পরিবহন ক্ষমতা বাড়ানো বা কমানো সম্ভব। এতে করে সংকর ধাতুকে আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি।
- বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতা হ্রাস বৃদ্ধি: গঠনকারী ধাতুর উপাদান পরিবর্তন করে আমরা সংকর ধাতুর বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতাও হ্রাস বৃদ্ধি করতে পারি। সেটা আমাদের বিভিন্ন কাজে লাগতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় গঠনকারী মৌলিক ধাতু হতে সংকর ধাতু উৎকৃষ্ট গুণ সম্পন্ন হয়ে থাকে। যেহেতু আমাদের ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা সংকর ধাতুর গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, কাজেই মৌলিক ধাতব পদার্থের তুলনায় সংকর ধাতুর গুরুত্ব ও ব্যবহার অনেক বেশি।

সারসংক্ষেপ

- বিভিন্ন প্রকার শিলার উপাদানই খনিজ পদার্থ যা সাধারণত খনি থেকে উত্তোলন করা হয়। অনেক সময় ভূ-পৃষ্ঠের উপরেও খনিজ পাওয়া যায়।
- খনিজ পদার্থ সাধারণত মৌলিক পদার্থ হিসাবে পাওয়া যায় না, অন্য পদার্থের সাথে যৌগ হিসাবে পাওয়া যায়। কোনো যৌগে যদি নির্দিষ্ট কোনো মৌলিক পদার্থের অনুপাত বেশি থাকে তাকে সেই মৌলের আকরিক বলে।
- আকরিক হতে কার্বন বিজারণ পদ্ধতি ও তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে ধাতু নিষ্কাশন করা হয়।
- ধাতু সাধারণত নমনীয়, কাজেই সব কাজে মৌলিক ধাতুর ব্যবহার সীমিত। এ কারণে একাধিক ধাতু মিশ্রণে প্রয়োজনীয় গুণ সম্পন্ন সংকর ধাতু তৈরি করা হয়। বর্তমান বিজ্ঞান ও উৎকর্ষতার যুগে তাই সংকর ধাতুর গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ভূ-ত্বকের গভীর থেকে যা তোলা হয় তাকে কি বলে?
   ক. শিলা খ. খনিজ
   গ. মৌলিক পদার্থ ঘ. জৈব পদার্থ

২. খনিতে মৌল হিসাবে পাওয়া যায় নিচের কোনটি?
   ক. লোহা খ. হীরা
   গ. তামা ঘ. সীসা

৩. সংকর ধাতু নয় নিচের কোনটি?
   ক. কাঁসা খ. ব্রোঞ্জ
   গ. দস্তা ঘ. জার্মান সিলভার

৪. ধাতব পদার্থের ধর্ম নয় নিচের কোনটি?
   ক. নমনীয়তা খ. ভঙ্গুরতা
   গ. সম্প্রসারণশীলতা ঘ. কাঠিণ্য

৫. ধাতু নিষ্কাশন করা হয় কোন পদ্ধতিতে?
   ক. কার্বন বিজারণ পদ্ধতিতে খ. পলিমারকরণ পদ্ধতিতে
   গ. পাতন পদ্ধতিতে ঘ. কেলাসন পদ্ধতিতে।

পাঠ ২.২

লোহা, ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়াম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- লোহার প্রকারভেদ উল্লেখ করতে পারবেন;
- ইস্পাতের প্রকারভেদ লিখতে পারবেন;
- লোহাতে মরিচা পড়ার কারণ বর্ণনা করতে পারবেন;
- লোহার মরিচা রোধে করণীয় পদক্ষেপ চিহ্নিত করতে পারবেন;
- অ্যালুমিনিয়ামের গুণাগুণ উল্লেখ করতে পারবেন।

লোহা

লোহা বা লৌহ একটি ধাতব মৌল। প্রাচীনকাল থেকেই লোহার ব্যবহারের কথা জানা যায়। অতি আধুনিক কালেও লোহাই মনে হয় সব চেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কত রকম কাজে যে লোহা ব্যবহার করা হয় তা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। এটি আমাদের অতীব প্রয়োজনীয় একটি মৌলিক পদার্থ। কিন্তু পৃথিবী পৃষ্ঠে লৌহ সাধারণত একাধিক যৌগ হিসাবে খনিতে পাওয়া যায়। লৌহের উল্লেখযোগ্য আকরিক হলো হেমাটাইট, ম্যাগনেটাইট, লিমোনাইট, পাইরাইটস ইত্যাদি। শিল্প ক্ষেত্রে লোহার আকরিকের সাথে কোক (কার্বন চূর্ণ) ও চুনাপাথর মিশিয়ে অতি উচ্চ তাপে ব্লাস্ট ফার্ণেস নামক বিশেষ চুল্লিতে গলান হয়। এতে লোহার বিভিন্ন অপদ্রব্য দূরীভূত হয়। গলিত লোহা চুলার তলায় জমা হয়। গলিত লোহাকে ঠান্ডা করলে শক্ত লোহা পাওয়া যায়। লোহাতে বিভিন্ন অনুপাতে কার্বন মিশিয়ে এর গুণাগুণ নির্ধারণ করা হয়।

লোহার প্রকারভেদ, গুণাগুণ ও ব্যবহার

লোহার মধ্যে কার্বনের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে লোহাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথা- ঢালাই লোহা (cast iron), পেটা লোহা (wrought iron) ও ইস্পাত (steel)।

চিত্র ২.২-১ এ লোহার প্রকারভেদ দেখান হলো :

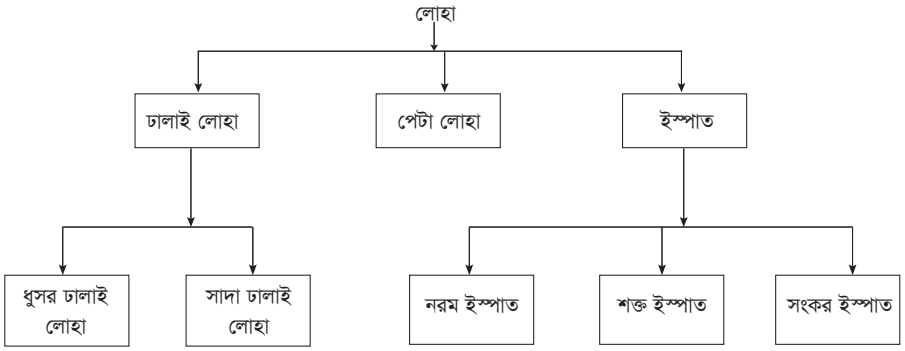

চিত্র : ২.২-১ : লোহার প্রকারভেদ

ঢালাই লোহা

গুণাগুণ

- কার্বনের পরিমাণ : ২.৫%।
- ভঙ্গুরতা ও ঘাতসহতা : পিটিয়ে পাত্‌লা পাতে পরিণত করা যায় না।
- পান দেয়া : পান দেয়া যায় না।
- গঠনাকৃতি : কেলাসাকার।
- নমনীয়তা : অনমনীয়, বাঁকানো কিছু তৈরি করা বা জোড়া দেয়া যায় না।
- চুম্বক ধর্ম : তড়িৎ চুম্বক এবং অস্থায়ী চুম্বকে পরিণত করা যায়।
- গলনাংক : ১২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
- কাঠিণ্য : অপেক্ষাকৃত কঠিন বা শক্ত।

ব্যবহার

- ঢালাই পদ্ধতিতে ছাঁচে ঢেলে প্রস্তুত করা হয় এমন দ্রব্যাদি যথা- কড়াই, রড, পানির পাইপ ইত্যাদি ঢালাই লোহা দ্বারা তৈরি।
- ঢালাই লোহা থেকে ইস্পাত ও পেটা লোহা প্রস্তুত করা যায়।
- বড় বড় জালা, লোহার ইস্ত্রি ঢালাই লোহা দিয়ে তৈরি করা হয়।
- বাটখারা, টিউবওয়েলের মাথা ইত্যাদি তৈরিতে ঢালাই লোহা ব্যবহার করা হয়।

পেটা লোহা

গুণাগুণ

- কার্বনের পরিমাণ : ০.১২-০.২৫%।
- পান দেয়া : পান দেয়া যায় না।
- গঠনাকৃতি : তন্তুর আকৃতি (Fiber)
- নমনীয়তা : নমনীয়, পিটিয়ে জোড়ালাগানো যায় এবং সরু তারে পরিণত করা যায়।
- চুম্বক ধর্ম : চুম্বকে পরিণত করা যায় না।
- গলনাংক : ১৫০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
- কাঠিন্য : অপেক্ষাকৃত নরম।

ব্যবহার

- পেটা লোহাকে টেনে সরু তার ও দালানে ব্যবহৃত রড তৈরি করা হয়।

- পিটিয়ে পাত্‌লা পাতে পরিণত করা যায় বলে বিভিন্ন শিট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
- তারের জালি, নাট, বল্টু ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

ইস্পাত বা স্টীল

গুণাগুণ

- কার্বনের পরিমাণ : ০.২৫–১.৫%।
- পান দেয়া : পান দেয়া যায়।
- গঠনাকৃতি : স্ফটিকাকার।
- নমনীয়তা ও ঘাতসহতা : উভয় ধর্ম বিদ্যমান তবে পেটা লোহার থেকে কম।
- চুম্বক ধর্ম : চুম্বককে পরিণত করা যায়।
- গলনাংক : ১৩০০-১৪০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস.।
- কাঠিন্য : কঠিন, ভঙ্গুরও নয় আবার নরমও নয়।

ব্যবহার

কোনো দেশ কতটা উন্নত তা সে দেশের ইস্পাতের ব্যবহার দেখে আন্দাজ করা যায়। এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যবহার হলো-

- গৃহস্থালী সামগ্রী তৈরি করতে।
- শিল্পক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি নির্মাণে।
- যানবাহন, যেমন- গাড়ি, প্লেন, জাহাজ, রেললাইন, ইত্যাদি নির্মাণে।
- ডাক্তারী ও ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি তৈরিতে।

লোহা ও ইস্পাতের মরিচা

লোহা ও ইস্পাতের জিনিস অনেকদিন খোলা বাতাসে রেখে দিলে এর গায়ে কালচে বাদামী রংয়ের আবরণ পড়ে। ক্রমেই এ প্রলেপ পুরু হতে থাকে। তারপর একসময় মাছের আঁইশের মত খুলে খুলে পড়তে থাকে। একেই মরিচা বলে। স্থানীয় ভাষায় এর নাম জং। এই মরিচার ফলে লোহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং পরিশেষে লোহা নষ্ট হয়ে যায়।

মরিচা সৃষ্টি

আদ্র বাতাসের সংস্পর্শে বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে লোহার রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় আয়রন অক্সাইডের একধরনের যৌগ। এই যৌগই মরিচা। মরিচা লোহার রং নষ্ট করে। লোহার সামগ্রীতে মরিচা পড়লে তা ক্রমশ : ক্ষয়ে ক্ষয়ে ভঙ্গুর হয়ে যায়। বার বার নতুন জিনিস কেনার চেয়ে মরিচা প্রতিরোধ করলে লোহার দ্রব্য বহুদিন টেকে।

মরিচা সৃস্টিকে নিম্নরূপ সমীকরণের আকারে দেখান সম্ভব-

লোহার সামগ্রী+আর্দ্র বাতাস = আয়রন অক্সাইড বা মরিচা

মরিচা প্রতিরোধের উপায়

বিভিন্ন উপায়ে মরিচা প্রতিরোধ করা যায়-

- **রং-এর প্রলেপ দিয়ে :** লোহা বা ইস্পাতের উপরে রং, বার্ণিশ ইত্যাদির প্রলেপ দিয়ে মরিচা রোধ করা যায়।

- **তৈল বা গ্রীজ ব্যবহার করে :** মেশিনের ঘূর্ণনশীল অংশে তৈল বা গ্রীজ লাগিয়ে মরিচা রোধ করা যায়।
- **গ্যালভানাইজিং করে :** লোহাকে গলিত দস্তায় ডুবিয়ে লোহার উপর দস্তার পাতলা প্রলেপ দেয়া হয়। ঘরের টিনে সহজে মরিচা পড়তে পারে না। গুড়া দুধের টিন বা টিনজাত খাবারের টিনগুলো মূলত লোহা ও ইস্পাতের তৈরি। এর উপর টিনে ধাতুর পাতলা প্রলেপ দেয়া থাকে ফলে এতে মরিচা ধরে না এবং ভিতরকার খাবার নষ্ট হয় না। এক ধাতুর উপর অন্য ধাতুর প্রলেপ দেয়াকেই গ্যালভানাইজিং বলে।
- **ইলেক্ট্রোপ্লেটিং করা :** লোহা বা ইস্পাত সামগ্রীর উপর তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে এক ধরনের প্রলেপ দেয়া হয়। একে ইলেক্ট্রোপ্লেটিং বলে। ইলেক্ট্রোপ্লেটিং পদ্ধতিতে লোহার উপর নিকেল, ক্রোমিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম এমনকি সোনা এবং প্লাটিনামের প্রলেপও দেয়া দেয়া হয়। এতে লোহা বা ইস্পাতের উপর মরিচা পড়ে না।
- ইস্পাতের সঙ্গে ক্রোমিয়াম ও নিকেল মিশিয়ে যে বিশেষ ইস্পাত তৈরি হয় তাকে স্টেইনলেস স্টিল বলে। এতে মরিচা পড়ে না।

নিচে চিত্র ২.২-২ এ ছক আকারে মরিচা প্রতিরোধের উপায় দেখান হল

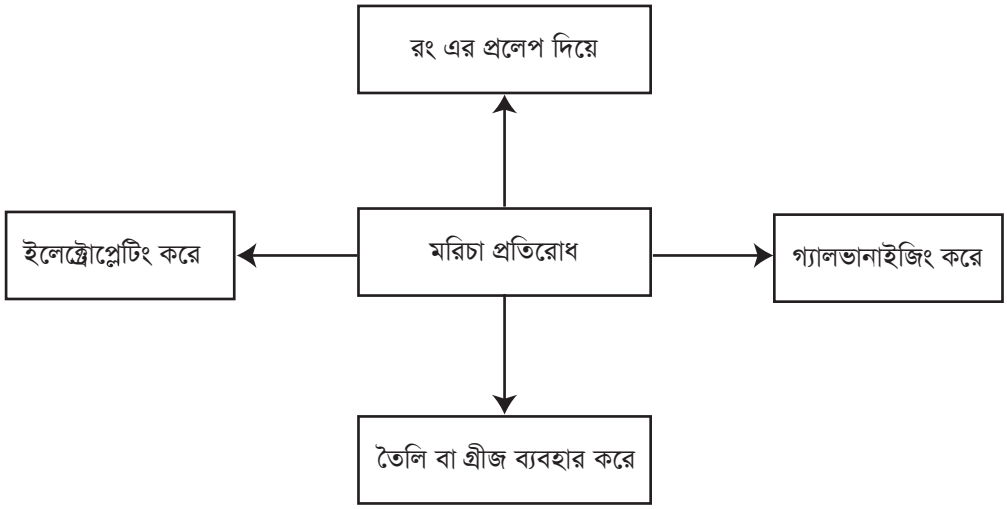

চিত্র ২.২-২ : মরিচা প্রতিরোধের উপায়

অ্যালুমিনিয়াম

পৃথিবীতে যে ধাতুটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় তা হলো অ্যালুমিনিয়াম, ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় শতকরা ৮ ভাগ। কিন্তু প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায় না। অ্যালুমিনিয়াম অন্যান্য মৌলিক পদার্থের সাথে যৌগ গঠন করে অবস্থান করে। এগুলো হলো অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- বক্সাইট, ক্রায়োলাইট, কোরানডাম, ফেলড্স্পার ইত্যাদি।

সাধারণত : বক্সাইট হতে অ্যালুমিনিয়াম সংগ্রহ করা হয়। নিম্নে অ্যালুমিনিয়ামের ধর্ম বা গুণাগুণ ও ব্যবহার আলোচিত হল-

ধর্ম বা গুণাগুণ

- বর্ণ : রূপার মত সাদা। বাণিজ্যিক অ্যালুমিনিয়াম নিলাভ সাদা।
- আপেক্ষিক গুরুত্ব : এ ধাতু বেশ হালকা, আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৭।
- নমনীয়তা : নমনীয়, একে পিটিয়ে পাতলা পাতে পরিণত করা যায়।
- ঘাত সহতা : একে টেনে সরু তারে পরিণত করা যায়।
- তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতা : তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহী। পরিবহন ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি।
- গলনাংক : ৬৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

- স্ফুটনাংক : ১৮০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বাষ্পে পরিণত হয়।
- সংকর ধাতু তৈরির ক্ষমতা : এটি ম্যাগনেসিয়াম, কপার, প্রভৃতি ধাতুর সঙ্গে সংকর ধাতু গঠন করতে পারে।
- বাতাসের সাথে ক্রিয়া : আর্দ্র বাতাসে অ্যালুমিনিয়ামের উপর অক্সাইডের পাতলা আবরণ পড়ে। কিন্তু এতে অ্যালুমিনিয়ামের ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয় না বরং অক্সাইডের প্রলেপ ভেতরের অ্যালুমিনিয়ামকে অক্সিজেনের হাত থেকে রক্ষা করে। তাই লোহার মরিচার মত এটি ক্ষতিকারক নয়।

ব্যবহার

- চুইংগাম, কেক, চকোলেট ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্যের মোড়ক তৈরিতে।
- বিদুৎ, তার ও কেবল উৎপাদনে।
- রান্নার হাঁড়ি-পাতিল প্রস্তুতিতে।
- সংকর ধাতু, যেমন- ডুরালুমিন উৎপাদনে।
- দরজা জানালার ফ্রেম, খেলনা ইত্যাদি তৈরিতে।
- আয়নার পালিশ বা পারা লাগানোর কাজে।
- তিসির তৈল বা ভার্ণিশ তেলের সাথে অ্যালুমিনিয়াম চূর্ণ মিশিয়ে রূপালী রংয়ের উজ্জ্বল, চকচকে ও দীর্ঘস্থায়ী ভার্ণিশ তৈরিতে।
- ক্যামেরার ফ্লাশ, বাল্বের ফিলামেন্ট তৈরিতে।
- উড়োজাহাজ, সেতু, মোটরগাড়ি ইত্যাদি নির্মাণে।
- পরীক্ষাগারে বিজারক হিসেবে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হয়।

সারসংক্ষেপ

- লোহা একটি অতি প্রয়োজনীয় মৌলিক পদার্থ। লোহাতে বিভিন্ন অনুপাতে কার্বন মিশিয়ে এর গুণাগুণ পরিবর্তিত আকারে পাওয়া সম্ভব।
- লোহা সাধারণত তিন প্রকার, ঢালাই, পেটা লোহা ও ইস্পাত। ঢালাই লোহা দিয়ে ঢালাই পদ্ধতিতে বিভিন্ন ছাঁচে ঢেলে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা হয়। পেটা লোহা টেনে সরু তার, পাতলা পাত, নাট, বল্টু ইত্যাদি তৈরি করা হয়। ট্রেনের লাইন, কলকারখানার যন্ত্রপাতিসহ উন্নতমানের জিনিস পত্র তৈরিতে ইস্পাত ব্যবহৃত হয়।
- লোহা ও ইস্পাত অনেকদিন আদ্র আবহাওয়ায় ফেলে রাখলে এতে মরিচা ধরে। বিভিন্ন প্রকার রং-এর প্রলেপ, ভার্ণিশ ও তৈল বা গ্রীজ ব্যবহার করে মরিচা প্রতিরোধ করা যায়।
- অ্যালুমিনিয়াম একটি হালকা ও নমনীয় ধাতু। এটি রুপার মত সাদা। হাঁড়ি-পাতিল তৈরি, জানালার ফ্রেম, তার, সংকর ধাতু ইত্যাদি তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ইস্পাতে কার্বনের পরিমাণ কত?
ক. ২.৫% খ. ০.১২-০.২০% গ. ০.২৫-১.৫% ঘ. ২.০-৩.৫%

২. লোহাতে মরিচা সৃষ্টির কারণ কি?
ক. আর্দ্র বাতাস খ. শুষ্ক বাতাস গ. উচ্চ তাপমাত্রা ঘ. নিম্ন তাপমাত্রা

৩. লোহাতে মরিচা প্রতিরোধ করা যায় কিভাবে?
ক. তাপ দিয়ে খ. শীতল করে গ. গ্যালভানইজিং করে ঘ. পানিতে ডুবিয়ে।

৪. লোহা ও ইস্পাতের সামগ্রীর উপর তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় যে প্রলেপ দেয়া হয় তাকে কি বলে?

ক. আস্তরায়ন খ. ইলেক্ট্রলাইটিং গ. ইলেক্ট্রোপ্লেটিং ঘ. হাইড্রো লাইটিং।

৫. সংকর ধাতুর গলনাংক মূল ধাতুর গলনাংকের চেয়ে নিম্নের কোনটি?
ক. সমান খ. কম গ.সামান্য বেশি ঘ. অনেক বেশি।

৬. পিতল তৈরি হয় কি কি দিয়ে?
ক. তামা ও টিন খ. তামা ও অ্যালুমিনিয়াম গ. তামা ও দস্তা ঘ. তামা ও লোহা।

পাঠ ৩

অধাতু ও বহুরূপতা, কয়লা, হীরক, গ্রাফাইট, গন্ধক ও ফসফরাস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অধাতুর বহুরূপতা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- অধাতুর বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- কয়লা বা কার্বন, হীরক ও গ্রাফাইটের উৎস এবং ব্যবহার উল্লেখ করতে পারবেন;
- গন্ধক ও ফসফরাসের ধর্ম ও ব্যবহার চিহ্নিত করতে পারবেন।

অধাতু ও বহুরূপতা

খনিতে যেমন পাওয়া যায় ধাতব আকরিক তেমনি পাওয়া যায় বিভিন্ন অধাতুর আকরিক। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অধাতুর আকরিকগুলো প্রকৃতিতে পাওয়া যায় মৌলিক বা বিশুদ্ধ মৌল হিসাবে। এই অধাতব মৌলগুলির মধ্যে এক ধরনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তা হল, একই মৌল প্রকৃতিতে বিভিন্ন ভৌত গুণাগুণ প্রদর্শন করে কিন্তু রাসায়নিক ধর্মের তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। অর্থাৎ কিছু অধাতব মৌলের রাসায়নিক গুণাগুণ মোটামুটি অভিন্ন হলেও ভৌত ধর্মের মধ্যে বিভিন্নতা থাকে। এইসব পদার্থ বা মৌলগুলোকেই বহুরূপী মৌল বলে এবং মৌলের এই বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় বহুরূপতা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, গ্রাফাইট ও হিরক একই মৌল কার্বন দ্বারা গঠিত হলেও এদের ভৌত ধর্ম এবং রাসায়নিক ধর্মে পার্থক্য বিদ্যমান। অর্থাৎ হীরক ও গ্রাফাইট হলো কার্বনের রূপভেদ। শুধু তাই নয়; প্রকৃতিতে কার্বন বিভিন্ন রূপে পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে গন্ধক ও ফসফরাস দুটি মৌলও বহুরূপী। প্রকৃতিতে চার ধরনের গন্ধক ও দুই ধরনের ফসফরাস পাওয়া যায়।
কার্বনের রূপভেদগুলির নাম

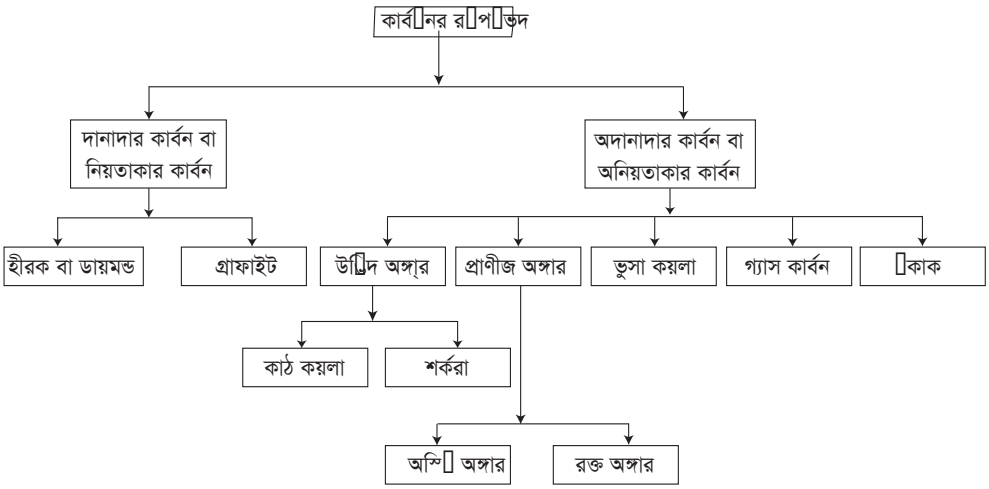

চিত্র ২.৩-১ : কার্বনের রূপভেদ

কয়লা

অকেলাসিত বা দানাহীন অবস্থায় প্রকৃতিতে যে কার্বন পাওয়া যায় তার নাম খনিজ কয়লা। এটি কঠিন শিলা স্তূপের মত খনিতে স্তরে স্তরে সঞ্চিত থাকে। তাপ উৎপাদনকারী পদার্থ হিসাবে এই কয়লা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খনিজ কয়লা সাধারণত উদ্ভিদ হতেই প্রাপ্ত। অতীতে বনাঞ্চল, ভূমিকম্প বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মাটির নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল এবং কালক্রমে তা বাতাসের অনুপস্থিতিতে ও ভূগর্ভস্থ তাপ ও চাপে বিধ্বংসী পাতন প্রক্রিয়ায় কয়লা উৎপন্ন হয়ে শিলাস্তরের খাঁজে খাঁজে আবদ্ধ হয়ে গেছে। এটি খনিজ কয়লা। এটি কার্বনের একটি রূপভেদ।

প্রানিজ কয়লাও কার্বনের আর একটি রূপভেদ। বায়ুশূন্য আবদ্ধ পাত্রে প্রাণীর চর্বিযুক্ত হাড় বা রক্ত রেখে তাপ প্রয়োগ করলে বিধ্বংসী পাতনের ফলে যে কয়লা উৎপন্ন হয় তাই প্রানিজ কয়লা। এর উপাদান প্রাণীর হাড় ও রক্ত। শুধু চর্বিযুক্ত হাড় হতে উপরোক্ত পদ্ধতিতে যে কয়লা পাওয়া যায় তাকে অস্থিজ কয়লা বলে। এই কয়লাকে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাহায্যে প্রক্রিয়াজাত করে আইভরি ব্ল্যাক তৈরি করা হয়। এটি সাধারণত শর্করা শিল্পে চিনির রং দূর করার জন্য এবং আইভরি ব্ল্যাক কাল রং প্রস্তুতে ব্যবহার করা হয়।

কাঠ কয়লাকে (উদ্ভিদ কয়লা) অল্প বাতাসে উত্তপ্ত করলে যে কয়লা পাওয়া যায় তাকে সক্রিয় কয়লা বলে। রাসায়নিকভাবে সক্রিয় কয়লারও মূল উপাদান হলো কার্বন।

সক্রিয় কয়লা সাধারণত গ্যাস, মুখোশ তৈরি ও ফিলটার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া সক্রিয় কয়লা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অনুঘটক হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। কাঠ কয়লা জ্বালানী রূপেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

হীরক ও গ্রাফাইট

কার্বনের দুটি বিশেষ রূপ হলো হীরক ও গ্রাফাইট। দুটি পদার্থই খনিতে পাওয়া যায়। ভূগর্ভের অভ্যন্তরে অত্যধিক তাপ ও চাপের প্রভাবে কোটি কোটি বছর ধরে রূপান্তরিত হয়ে কার্বন কেলাসিত হয়ে গ্রাফাইট ও হীরকে পরিণত হয়।

হীরক ও গ্রাফাইটের মধ্যে পার্থক্য নিম্নে ছক ২.৩-১ এর মাধ্যমে দেখানে হল :

তুলনামূলক ধর্ম	হীরক	গ্রাফাইট
বর্ণ ও আকার	বর্ণহীন, স্বচ্ছ, উজ্জ্বল, স্ফটিকাকার পদার্থ	ধূসর, কাল, অস্বচ্ছ, স্ফটিকাকার পদার্থ
কাঠিন্য	সবচেয়ে কঠিন পদার্থ	নরম ও পিচ্ছিল পদার্থ
আপেক্ষিক গুরুত্ব	৩.৫ সর্বোচ্চ, গ্রাফাইট অপেক্ষা বেশি	২.২৫, হীরক অপেক্ষা কম
তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহন	অপরিবাহী	সুপরিবাহী
দহনশীলতা	৯০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় CO_2	৭০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় CO_2

	উৎপন্ন করে	উৎপন্ন করে
রাসায়নিক সক্রিয়তা	সহজে বিক্রিয়া করে না	অসক্রীয় তবে হীরকের তুলনায় সক্রীয়
গলনাংক	খুব বেশি	বেশি তবে হীরক অপেক্ষা কম
কাগজে দাগ কাটার ক্ষমতা	নেই	ঘষলে দাগ পড়ে
কাঁচ কাটার ক্ষমতা	আছে	নাই

ছক ২.৩-১ : হীরক ও গ্রাফাইটের পার্থক্য

হীরকের ব্যবহার

- অলংকার প্রস্তুতে রত্ন হিসাবে হীরকের ব্যবহার সুপ্রাচীন কাল হতে চলে আসছে।
- বিশেষ এক ধরনের হীরার রং কালো। নাম- কার্বনেডো। ইহা কাঁচ কাটা ও পালিশের কাজে ব্যবহৃত হয়।
- হীরক-চূর্ণ দিয়ে রং তৈরি হয়।
- লোহা ও অন্যান্য কঠিন ধাতব পদার্থ কাটার যন্ত্রে হীরক ব্যবহৃত হয়।
- কঠিন পদার্থের মাঝে ছিদ্র করার কাজে হীরক ব্যবহার হয়।

গ্রাফাইটের ব্যবহার

- তড়িৎ শলাকা রূপে, টর্চের ব্যাটারী, রেডিও ট্রানজিস্টার ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।
- গ্রাফাইট নরম এবং পিচ্ছিল। এ জন্য কলকব্জায় লুব্রিকেন্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
- কাঠ পেন্সিলের সীসা তৈরিতে গ্রাফাইট ব্যবহার করা হয়।
- উচ্চতাপ সহ্যকারী ক্রুসিবল তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।
- ইলেক্ট্রোটাইপের কাজে গ্রাফাইট প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়।
- আনবিক চুল্লীতে মন্দনকারী হিসাবে গ্রাফাইট ব্যবহার করা হয়।

গন্ধক বা সালফার

প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ গন্ধক বা সালফারের সাথে পরিচিত। বেশিরভাগ গন্ধকই খনিতে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত গন্ধক দানাদার বা কেলাসিত। গন্ধকের চারটি রূপভেদ হল- রম্বিক গন্ধক; একাক্ষী গন্ধক; প্লাস্টিক বা নমনীয় গন্ধক ও শ্বেত গন্ধক।

ভৌত ধর্ম

- গঠন : দানাদার বা কেলাসাকৃতি।
- কাঠিন্য : ভঙ্গুর কঠিন অধাতব পদার্থ।
- দ্রবণীয়তা : পানিতে অদ্রবণীয় কিন্তু রাসায়নিক দ্রাবকে দ্রবণীয়।
- তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহীতা : গন্ধক তাপ ও বিদ্যুৎ অপরিবাহী।
- বহুরূপতা : গন্ধক একটি বহুরূপী মৌল।
- গলনাংক ও স্ফুটনাংক : বহুরূপতার কারণে গন্ধকে গলনাংক ও স্ফুটনাংক ভিন্ন। সর্বনিম্ন গলনাংক ১১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও স্ফুটনাংক ৪৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
- তাপ প্রয়োগ : তাপের প্রভাবে বিভিন্ন ভৌত ধর্ম বিশিষ্ট সালফারে পরিণত হয়।

রাসায়নিক ধর্ম

- গন্ধক একটি সক্রিয় মৌল। প্রায় সব ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়ায় বিভিন্ন যৌগ তৈরি করে।
- বাতাসে নীল শিখাসহ জ্বলে। দম আঁটকানো পঁচা ডিমের গন্ধযুক্ত সালফার-ডাই-অক্সাইড নামক এক প্রকার গ্যাস তৈরি করে।
- পানির উপস্থিতিতে বায়ুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে সালফিউরিক এসিড উৎপন্ন করে।
- গন্ধক ঋণাত্মক মৌলের সাথে জারক/বিজারক হিসাবে যুক্ত হয়ে অধাতব সালফাইড উৎপন্ন করে।

ব্যবহার

- সালফা- ডাই-অক্সাইড, কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
- জীবাণু-নাশক রূপে ঔষধ তৈরিতে।
- দিয়াশলাই শিল্পে।
- নানা প্রকার রং প্রস্তুতিতে।
- সার প্রস্তুতিতে।
- বারুদ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।
- রাবারের সাথে গন্ধক মিশিয়ে তাপ দিলে রাবার নমনীয়, শক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী হয়।
- বিরঞ্জক হিসাবে সালফারের ব্যবহার বিদ্যমান।

ফসফরাস

আর একটি অধাতব বহুরূপী মৌল হলো ফসফরাস। ফসফরাস একটি গ্রীক শব্দ যার অর্থ হলো দীপ্তিমান। অন্ধকারে মৌলটি মৃদু আভা বিকিরণ করে বলে এর নাম দেয়া হয়েছে ফসফরাস। ফসফরাস অত্যন্ত সক্রিয় মৌল। প্রকৃতিতে ফসফরাস তাই যৌগ অবস্থায় থাকে। ফসফরাসের প্রধান উৎস হলো জীবজন্তুর হাড়, ডিমের হলুদ অংশ, দুধ, দৈ, মাছ এমন কি শিমের মধ্যেও ফসফরাস বিদ্যমান।

সালফারের মত ফসফরাসও প্রকৃতিতে দানাদার বা কেলাসিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই কেলাস প্রধানত : দুই ধরনের। অর্থাৎ ফসফরাসের রূপভেদ দুটি-

- শ্বেত ফসফরাস (White phosphorus)
- লোহিত ফসফরাস (Red phosphorus)

ফসফরাসের এ দুটি রূপভেদের ধর্ম ও ব্যবহার ছক আকারে আলোচনা করা হলো-

ধর্ম

ভৌত ধর্ম

	শ্বেত ফসফরাস	**লোহিত ফসফরাস**
অবস্থা	মোমের মত নরম	অদানাদার গুড়া পদার্থ
বর্ণ	সাদা (প্রায় বর্ণহীন)	চকোলেট, লালচে বাদামী
গন্ধ	রসুনের ন্যায় গন্ধ	গন্ধহীন
আপেক্ষিক গুরুত্ব	১.৮	২.২
গলনাংক	৪৪০°	
স্ফুটনাংক	২৮৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস.	অতি উচ্চ
দ্রাব্যতা	পানিতে অদ্রবণীয়, জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয়	পানিতে ও জৈব দ্রাবকে অদ্রবণীয়
বিদ্যুৎ পরিবাহীতা	খুব সামান্য বিদ্যুৎ পরিবাহী	সামান্য পরিবাহী

রাসায়নিক ধর্ম

সক্রিয়তা	ইহা অত্যন্ত সক্রিয়	কম সক্রিয়
বায়ুর সঙ্গে ক্রিয়া	বায়ুতে জারিত হয় এবং হাল্কা সবুজ দ্বীপ্তিসহ জ্বলতে থাকে	বায়ুতে সহজে জ্বলে না
প্রাণিদেহে ক্রিয়া	প্রাণিদেহের জন্য বিষাক্ত	প্রানিদেহের জন্য বিষাক্ত নয়।

ব্যবহার

শ্বেত ফসফরাস	লোহিত ফসফরাস
হাত বোমা, আগুনে বোমা ও যুদ্ধকালে ধূম্রজাল সৃষ্টিতে শ্বেত ফসফরাস ব্যবহৃত হয়।	দিয়াশলাই শিল্পে লৌহিত ফসফরাস প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। দিয়াশলাইয়ের দুপাশে যেটিকে আমরা বারুদ বলি।
লোহিত ফসফরাস তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।	ফসফরিক এসিড, ফসফরাস পেন্টাক্সাইড ও ফসফরাস ক্লোরাইড প্রস্তুতে লোহিত ফসফরাস ব্যবহৃত হয়।
ফসফেট ও টি.এস.পি সার তৈরিতে ফসফরাস ব্যবহৃত হয়।	ফসফরাস ব্রোঞ্জ নামক সংকর ধাতু তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।

ছক ২.৩-২ : ফসফরাসের দুটি রূপভেদের ধর্ম ও ব্যবহার

সারসংক্ষেপ

- অধাতু বা অধাতব পদার্থসমূহ সাধারণত ভঙ্গুর এবং ধাতব পদার্থের মতই খনিতে পাওয়া যায় অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ মৌল হিসাবে। কার্বন, সালফার, ফসফরাস ইত্যাদি অধাতব পদার্থ।
- অধাতব পদার্থ বহুরূপে পাওয়া যায়। যেমন কার্বন ভূগর্ভের অভ্যন্তরে অত্যাধিক তাপ ও চাপের ফলে কালক্রমে গ্রাফাইট এবং পরে হীরকে পরিণত হয়। মূলত কার্বন বা কয়লা, গ্রাফাইট ও হীরক কয়লারই বিভিন্নরূপ। ইহাকে অধাতুর বহুরূপতা বলা হয়।
- সালফার ও ফসফরাস এ দুটি অধাতব পদার্থ বিভিন্ন দ্রব্যাদি তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কার্বনে প্রতীক কি?
   ক. Cr খ. CO
   গ. C ঘ. Cu

২. হীরক ও গ্রাফাইটের মূল উপাদান কি?
   ক. কার্বন খ. গ্রাফাইট
   গ. ভূসা কালি ঘ. কোক

৩. প্রকৃতিতে কত ধরনের গন্ধক পাওয়া যায়?
   ক. দুই ধরনের খ. তিন ধরনের
   গ. চার ধরনের ঘ. পাঁচ ধরনের

৪. নিচের কোনটি বহুরূপী মৌল
   ক. লৌহ খ. সোডিয়াম
   গ. অ্যালুমিনিয়াম ঘ. গন্ধক।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. আকরিক কি? দুটি ধাতব আকরিকের নাম লিখুন?
২. গ্যাং কি?
৩. লোহার ৫টি আকরিকের নাম লিখুন।
৪. গ্যালভানাইজিং ও ইলেক্ট্রোপ্লেটিং কি?
৫. স্টেইনলেস স্টিলের উপাদানগুলি কি কি?
৬. ডুরালুমিন কি?
৭. দিয়াশলাই শিল্পে কোনো ফসফরাস ব্যবহৃত হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. খনিজ কি? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।
২. কিভাবে আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাষণ করা হয়।
৩. লোহা কত প্রকার ও কি কি? এদের গুণাগুণ ও ব্যবহার উল্লেখ করুন।
৪. মরিচা কি? কিভাবে মরিচার সৃষ্টি হয়? মরিচা প্রতিরোধের উপায় কি?
৫. সংকর ধাতু কি? সংকর ধাতুর গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৬. বহুরূপতা কি? কয়েকটি বহুরুপী মৌলের নাম এবং এদের উল্লেখযোগ্য রূপভেদের নাম লিখুন।
৭. হীরক ও গ্রাফাইটের মধ্যে পার্থক্য কি? এদের ব্যবহারগুলি লিখুন?
৮. গন্ধক ও ফসফরাসের ধর্ম ও ব্যবহার আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১ :	১. খ	২. খ	৩. গ	৪. খ	৫. ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২ :	১. গ	২. ক	৩. গ	৪. গ	৫. খ	৬. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩ :	১. গ	২. ক	৩. গ	৪. ঘ		